১৬ লক্ষ চশমা!

আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

২০০৪ সালের কথা। আমার তখন নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করার প্রায় দু'বছর পূর্ণ হয়েছে। সহকর্মী এলেনা এডামস-এর সঙ্গে মিলে আমি দুটো কোর্স পড়াতাম। একটি ছিল 'হেলথ ইকুইটি' এবং অপরটি 'কম্যুনিটি পার্টিসিপেশন'। কলম্বিয়াতে মাস্টার্স ইন পাবলিক হেলথ বা এমপিএইচ করতে লাগে পুরো ২ বছর। কিন্তু হার্ভার্ড বা জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে একই কোর্স করতে লাগে ১ বছর। এই নিয়ে কলম্বিয়ার মেইলম্যান স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর ডিন এলেন রজেনফিল্ড বা নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে, এই কোর্সের জন্য দু'বছর অত্যধিক এবং এটার হয়তো প্রয়োজনও নেই। কিন্তু আমেরিকার বনেদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের স্বীয় ঐতিহ্য আর ইতিহাস ধরে রাখতে সদা সচেষ্ট বলে তারা কারিকুলাম কাঠামোতে সহজে খুব একটা পরিবর্তন আনতে চায় না। তাই কলম্বিয়াতে আজও এমপিএইচ পড়ানো হয় ২ বছর মেয়াদে। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে যখন আমরা এমপিএইচ চালু করলাম, তার পরিসর কিন্তু ১ বছরেই সীমিত রেখেছি। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির 'জেমস্ পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ' বিশ্বমানের একটি সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির এমপিএইচ কোর্সের শিক্ষার্থীদের মাঠপর্যায়ে যে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেওয়া হয়, তা পৃথিবীর অন্যকোনো প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয় বলে আমার জানা নেই।

কলম্বিয়া শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নয় বরং বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম। এটি 'আইভি লিগে'র অন্তর্ভুক্ত একটি এলিট ইউনিভার্সিটিও বটে। এখানে কাজ করার সুবাদে নিউইয়র্ক নগরীতে অবস্থিত অনেক বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। একবার একটি চিঠি পেলাম কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্স বা সিএফআর থেকে। তাদের নিউইয়র্কের অফিসে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উদ্যোক্তা বা হেলথ অন্ট্রাপ্রেনারশিপ নিয়ে একটি সভায় আমাকে ব্র্যাক সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা করতে বলা হলো। চিঠির লেখক সিএফআর এর গ্লোবাল হেলথ পলিসি প্রোগ্রামের আহ্বায়ক জর্ডন কাসালো। কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্স আমেরিকার একটি শীর্ষ এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী সংগঠন। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত সিএফআর একটি সদস্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। এর সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন দেশের প্রথিতযশা সব ব্যক্তিবর্গ যেমন : প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ডাকসাইটে অধ্যাপক, সাংবাদিক বা উজ্জ্বল চিত্র তারকা। প্রভাবশালী সাময়িকী 'ফরেন রিলেশনস' সিএফআর-এর একটি প্রকাশনা।

সিএফআর থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে বেশ গর্বিত ও উৎফুল্ল হয়েছিলাম। তাদের দু'টো অফিসের একটি নিউইয়র্কে অবস্থিত। অন্যটি দেশের রাজধানী ওয়াশিংটনে। নির্ধারিত দিনে দুপুর সাড়ে তিনটের দিকে পৌঁছালাম নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের সিএফআর এর কার্যালয় 'হেরল্ড প্রেট হাউস'-এ। বিশাল এক স্থাপনা। জর্ডন কাসালো আমাকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে গেলেন সভাকক্ষে। বেশ বড় কক্ষ। সম্ভবতঃ পঞ্চাশটির মতো চেয়ার গোলটেবিল ঘিরে বৃত্তাকারে সাজানো। আমার সঙ্গে আরও দু'জন বক্তা। তাদের একজন একুমেন ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতা জ্যাকুলিন নভোগ্রাজ। তিনি বললেন, তার প্রতিষ্ঠানের দর্শন তথা কার্যাবলির কথা। তাদের বিশ্বাস এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ছোট পরিসরের লোকসেবামূলক দান গরিবী হটাতে বিশেষ কার্যকর হতে পারে। দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন স্বয়ং জর্ডন কাসালো। তিনি স্কজো ফাউন্ডেশন নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং নিজে নিউইয়র্কের একজন প্রতিষ্ঠিত অপটোমেট্রিস্ট বা চশমার ডাক্তার। তৃতীয় বক্তা আমি। আমার বক্তৃতায় ব্র্যাক কীভাবে দারিদ্র্য নির্মূল করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, তার একটি বর্ণনা দিলাম। দারিদ্র্যকে পুরোদমে দূর করতে হলে দারিদ্র্যের মূল যেসব কারণ যেমন : অশিক্ষা, নারীর ক্ষমতাহীনতা, দুর্বল স্বাস্থ্য, বেকারত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ জোর দিতে হবে। ব্র্যাক একটি বেসরকারি সংস্থা, কিন্তু এর কার্যক্রম বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের দ্বারে পৌঁছেছে এবং দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। তখন সবেমাত্র ব্র্যাক আফগানিস্তানে তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। এই সুযোগে তাও বললাম। বক্তব্যের শেষে ব্র্যাকের ওপর নির্মিত ১৫ মিনিটের একটি ভিডিও প্রদর্শন করেছিলাম। তিনটি উপস্থাপনার শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রশ্নবান ছিল আমার দিকেই বেশী। মনে হচ্ছিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত সিএফআর-এর সদস্যদের খুব কম সংখ্যকই ব্র্যাক সম্পর্কে জানেন। সেজন্য আমার বক্তব্য তথা ব্র্যাকের বিশাল কর্মসূচির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে তাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। 'টু গুড টু বিলিভ'। কীভাবে একটি বাংলাদেশি এনজিও এতসব কাজ করতে পারে? একটি মিশ্র অনুভূতি

নিয়ে সেদিন অনুষ্ঠান থেকে ফিরেছিলাম। পরদিন ডিন এলেন রজেনফিল্ডের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলাপও করেছিলাম। তিনি অভয় দিয়ে বলেছিলেন যে, এতে মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার কোনো কারণই নেই। যারা সভায় এসেছেন তাদের ধারণা হলো যে এনজিওরা আকারে ছোট হয় এবং সাধারণত স্বল্প পরিসরে ছোট ছোট কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। ব্র্যাকের মতো মহীরুহ এদের কল্পনাতে নেই। বরং এদের কাউকে কাউকে বাংলাদেশে নিয়ে গেলে তাদের ভুল ভাঙ্গবে। কথায় আছে, সিইং ইজ বিলিভিং। আজ আমি অনেকটা আশ্বস্ত এই ভেবে যে, সে সময়ের চিত্র এখন আর নেই। আমেরিকা তথা সারাবিশ্বে ব্র্যাক এখন শুধু একটি নাম নয়, এটি একটি দর্শনের সফল রূপান্তর এবং সার্থক বাস্তবায়ন। ২০০৬ সালে এলেন রজেনফিল্ডের পৌরোহিত্যে ব্র্যাক ইউএসএ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ব্র্যাককে আমেরিকায় পরিচিত করতে বিশেষ অবদান রেখেছে। এলেন রজেনফিল্ড আজ আর বেঁচে নেই। পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে তিনি ওপারে চলে গেছেন। ব্র্যাকের অকৃত্রিম বন্ধু এবং আমার এক নিঃস্বার্থ শুভার্থী এই মনীষীর প্রতি রইল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। এ ছাড়াও আরও কিছু ব্যক্তি ব্র্যাককে আমেরিকায় পরিচিত করতে অবদান রেখেছেন। তাদের একজন হলেন সুসান ডেভিস। ব্র্যাক-ইউএসএ-র প্রথম নির্বাহী। নব্বই দশকে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের প্রধান হিসেবে সুসান ঢাকায় কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন। তিনি আমেরিকায় গ্রামীণ ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন হিসেবেও কাজ করেছেন।

সেদিনের সিএফআর-এর সভার মধ্য দিয়ে জর্ডন কাসালোর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। জর্ডন প্রথমে আমাকে তার স্কজো ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে এবং পরবর্তীতে আমার স্ত্রী-সন্তানসহ তার বাসায় নেমন্তন্ন করেন। আমাদের উভয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে একাত্মতা এবং মনের মিল ছিল। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নতি কীভাবে ত্বরান্বিত করা যায়, এ নিয়ে জর্ডনের মাঝে একটি বিশেষ অনুভূতি ছিল লক্ষণীয়। জানলাম যে, স্কজো ফাউন্ডেশন পৃথিবীর কয়েকটি দেশ যেমন ভারত এবং এল-সালভেডরে নামমাত্র মূল্যে রিডিং গ্লাস বা চশমা বিতরণ করছে। চোখের একটি সমস্যা 'প্রেসবায়োপিয়া' যা বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বয়স ৩৫-৪০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকে বেশিরভাগ লোকেরই দৃষ্টি সমস্যা দেখা দেয়। এর ফলে কাছের জিনিস অস্পষ্ট হতে থাকে। ধারণা করা হয় যে, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৫২ কোটি লোক চোখের এই সমস্যায় আক্রান্ত। 'প্রেসবায়োপিয়া'-র কারণে মানুষের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। অনেকে এ কারণে আবার মানসিক অশান্তিতে ভোগেন। কেউবা নিত্যকার কাজ যেমনঃ সংবাদপত্র পাঠ, কোরআন তেলওয়াত, গীতা বা অন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে পারেন না। 'প্রেসবায়োপিয়া'-র কারণে পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক ক্ষতি বছরে আনুমানিক ২০ হাজার কোটি ডলার। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের সহজ, নিরাপদ এবং ব্যয়সাশ্রয়ী সমাধান হলো রিডিং গ্লাস-এর ব্যবহার। অপটোমেট্রিস্ট হওয়ার কারণে জর্ডন জেনেছেন যে, কীভাবে রিডিং গ্লাসের ব্যবহার একজন মানুষের জীবনকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে। তাই তিনি এবং তার ফাউন্ডেশন ভাবছিল কীভাবে রিডিং গ্লাসকে দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কাজটি করতে গেলে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো কীভাবে রিডিং গ্লাসের ধারণাকে দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে এলো হাজার মাইল দূরে বাংলাদেশে কর্মরত ব্র্যাকের হাজার হাজার স্বাস্থ্যসেবিকার কথা। জর্ডনের অফিসে বসে কেবলই মনে হতে লাগল রিডিং গ্লাসের মতো ৭শ বছরের পুরনো একটি অতি সাধারণ এবং লাগসই প্রযুক্তি কেন আমরা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাগালের মধ্যে আনতে পারব না। মনে পড়ল আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন তথা আড়ং-এর হাজার হাজার কারিগর বা আর্টিসানের কথা, যাদের মূল সম্পদ হলো তাদের চোখ। জানতাম, চোখে কম দেখার কারণে অনেকেই সুক্ষ্ম কাজ করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েন। এর ফলে অনেকের রোজগার কমে যেত, এমনকি কেউ কেউ কাজও হারিয়েছেন। চোখের ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে হয়তো একটা বিহিত হতো, কিন্তু তা ছিল বেশিরভাগ লোকের সাধ্যের অতীত। অনেকেরই তখন জানা ছিল না যে, চোখের এ অসুবিধা নিরসনের জন্য কোনো চোখের ডাক্তারের (যাদের বলা হয় অপথালমোলজিস্ট) প্রয়োজন নেই। উন্নত দেশগুলোতে এই সমস্যা সমাধানে একটি আলাদা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। একজন অপটোমেট্রিস্ট চোখ পরীক্ষা করে চশমা দেন আর অপথালমোলজিস্ট (স্বীকৃত চোখের ডাক্তার) মানুষের চোখে অন্যকোনো ধরনের জটিল সমস্যা দেখা দিলে তার চিকিৎসা করেন এবং প্রয়োজনে অপারেশনও করে থাকেন। 'ট্রায়াল এবং এরর'-এর মাধ্যমে আমাদের দেশে চোখের ডাক্তাররা নির্ণয় করেন কার কত পাওয়ারের চশমা লাগবে এবং সে অনুযায়ী তারা পরামর্শ দেন। জর্ডন জানালেন যে, তাদের দেশে চোখের ডাক্তার বা অপথালমোলজিস্ট কখনও প্রেসবায়োপিয়া নিয়ে মাথা ঘামায় না। এটা অপটোমেট্রিস্ট-এর কাজ। এই প্রযুক্তিটি এতই সহজ এবং নিরাপদ যে, যে কেউ ফার্মেসিতে সাজানো বিভিন্ন পাওয়ারের চশমা দেখে নিজেই ঠিক করে নিতে পারে যে, কোন চশমা তার জন্য সঠিক বা উপযুক্ত। উন্নত বিশ্বের ন্যায় ভারতে অনেক বিশবিদ্যালয়ে

অপটোমেট্রিতে উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। বাংলাদেশে কয়েকটি সংস্থা যেমন : ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল এবং বিএনএসবি এক বছরের একটি ডিপ্লোমা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যার মাধ্যমে কিছু মিড লেভেল অপথালমিক প্রফেশনাল বা এমএলওবি তৈরি হচ্ছে। এরা মূলতঃ চোখের ডাক্তার বা অপথালমোলজিস্টদের সহকারী হিসেবে কাজ করে থাকেন। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অপটোমেট্রি শিক্ষা চালু করা খুবই প্রয়োজনীয়। এটা সময়ের দাবী। এর মধ্য দিয়ে এ ধরনের সেবাপ্রাপ্তি সহজলভ্য হবে এবং চোখের ডাক্তারদের আরও জটিল কাজে মনোনিবেশ করার সুযোগ তৈরি হবে।

জর্ডনের সঙ্গে আলোচনা শেষে বাসায় ফিরেই ফোন করলাম ঢাকায়। বন্ধু ফারুক আহমেদ তখন ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মসূচির পরিচালক। তার সঙ্গেই প্রথমে কথা হলো। সব শুনে তাকে বেশ কৌতূহলদীপ্ত মনে হলো। সে বলল, নিশ্চয়ই আমরা স্বাস্থ্যসেবিকার মাধ্যমে রিডিং গ্লাসের প্রচলন পরীক্ষা করে দেখতে পারি। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীবাহিনীর অপ্রতুলতা সর্বজন বিদিত। এই ঘাটতি বা অভাব পূরণ করতে ব্র্যাক সত্তর দশকের শেষদিক থেকে বাংলাদেশে স্বল্প শিক্ষিত মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবিকা হিসেবে প্রশিক্ষিত করার কার্যক্রম শুরু করে। এক পর্যায়ে এই সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়ে যায়। ব্র্যাকের এই কর্মসূচি আন্তর্জাতিক অঙ্গণে অনেক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে, যার ফলে উগান্ডা, আফগানিস্তান, লাইবেরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে আজ এটি ব্যাপ্তি লাভ করেছে। কয়েকটি সহজ এবং সাধারণ রোগ ছাড়াও সেবিকারা কিছু কঠিন রোগ যেমন : যক্ষ্মারও সফল চিকিৎসা করে থাকেন।

২০০৪ সালের শেষদিকে নিউইয়র্ক থেকে দেশে ফিরে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির স্কুল অব পাবলিক হেলথ প্রতিষ্ঠার কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ততায় ডুবে ছিলাম। রেজিস্ট্রার সাহ্লল আফজালের অক্লান্ত পরিশ্রমে সরকারি অনুমোদন পেয়ে ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এমপিএইচ-এর প্রথম ব্যাচের যাত্রা শুরু হয়। এই বিষয়ে অবশ্য অন্য পরিসরে আরও লেখার ইচ্ছা রইল। কিন্তু এত ব্যস্ততার মাঝেও রিডিং গ্লাসের কথা ভুলে যাইনি। ফারুক এ ব্যাপারে আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে কিছুটা আলাপ করেছিল। ফিরে এসে আমি আবারও বিষয়টি তাঁর নজরে আনলাম। একইসঙ্গে উপ-নির্বাহী পরিচালক সালেহউদ্দীন আহমেদ এবং আমিনুল আলমের সঙ্গেও কথা হলো। তারা সকলেই পরম উৎসাহে এ উদ্যোগে সায় দিলেন। উল্লেখ্য, ব্র্যাকের এত প্রসিদ্ধির পেছনে অন্যতম শক্তি হচ্ছে তার উদ্যোগী কর্মীবাহিনী, তাদের কর্মস্পৃহা ও উদ্ভাবনী চিন্তা। আর আবেদভাই ছিলেন সব কিছুর পেছনের মূল চালিকা শক্তি। তিনিই সব উদ্ভাবন এবং ইনোভেশনের আধার, যাকে বলা যায় ‘ফাদার অব অল ইনোভেশন’। আবেদ ভাইয়ের চরিত্রের আরেকটা দিক ছিল অন্যের মতামত আগ্রহভরে শোনা। তিনি ছিলেন ওস্তাদ লিসেনার। রিডিং গ্লাসের কথা বলতেই তিনি সঙ্গেসঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, একটি পাইলট করে দেখ আমাদের সেবিকারা এই কাজটি সঠিকভাবে করতে পারে কিনা। আমার তো এবার মহাখুশি হওয়ার পালা।

অফিসে ফিরেই জর্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। অপর প্রান্তে তার উত্তেজনা আমি অনুভব করতে পারছিলাম। সে জানালো যে, আমাদের সঙ্গে এই বিষয়ে কাজ করে কর্মসূচি প্রণয়নের জন্যে তার এক সহকর্মীকে শীঘ্রই বাংলাদেশে পাঠাবে। কিছুদিনের মধ্যেই নীল ব্লুমেনথাল নামে স্কজো ফাউন্ডেশনের এক নির্বাহী এসে উপস্থিত হলেন ঢাকায়। আমরা পরম উৎসাহভরে পাইলট কর্মসূচির কাজে লেগে গেলাম। ঠিক হলো পাইলটটি ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীনে পরিচালিত হবে এবং এর মাঠ পর্যায়ের দায়িত্বে থাকবেন জ্যৈষ্ঠ ব্যবস্থাপক আব্দুস সালাম (পরবর্তীতে লাইবেরিয়ায় ব্র্যাকের দেশীয় প্রতিনিধি এবং কক্সবাজার রোহিঙ্গা প্রকল্পের প্রধান)। এ উদ্যোগে সালামের প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল লক্ষণীয়। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, সালাম সে সময় দৃঢ়ভাবে হাল না ধরলে আজ আমরা এতটা সাফল্য অর্জন করতে পারতাম না। ব্র্যাকের একটা বিশেষত্ব হলো যে, মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা প্রতিটি দায়িত্বকেই নিজের কাজ হিসেবে গণ্য করে তা বাস্তবায়নে মরিয়া হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, এমন কর্মীবাহিনী না থাকলে ব্র্যাক কোনোভাবেই আজকের অবস্থানে পৌঁছতে পারত না। কর্মীরাই ব্র্যাকের শক্তি, তারাই স্থাপন করেছেন একের পর এক ব্র্যাকের সাফল্যের সোপান। মনে পড়ছে ২০১৩-২০১৪ সালে আফ্রিকার ইবোলা সংকটের কথা। ইবোলা আক্রান্ত দু'টি দেশ লাইবেরিয়া এবং সিয়েরা লিওনে ব্র্যাকের অনেক কর্মসূচি চলছিল। ইবোলার কারণে সেই কাজগুলো সাময়িক বন্ধ করে যত বিদেশী কর্মী ছিল তাদেরকে উগান্ডা এবং বাংলাদেশে ফেরত নিয়ে আসা হয়। অচিরেই আমরা বুঝতে পারলাম যে, এই কাজটি সঠিক হয়নি, কারণ ওই দেশগুলোর সাধারণ জনগণ এবং ব্র্যাকের স্থানীয় কর্মীদের ফেলে আসা মানবিক মানদণ্ডে সমর্থনীয় নয়। বিবেচনান্তে ঠিক হলো ব্র্যাককর্মীরা আবার ফিরে যাবে। ইবোলা নিয়ে তখন খুব ভয় ও আতঙ্ক বিরাজ করছিল। এই পরিবেশে কর্মীদের ফেরত পাঠানো সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু না। দেখলাম, কর্মীদের অনেকেই এক পায়ে খাঁড়া এবং তার অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে সালাম।

যাহোক, এবার সেই সালামের নেতৃত্বেই রিডিং গ্লাস পাইলট প্রকল্প যাত্রা শুরু করল। প্রথমে নরসিংদীর মাধবদী এবং পরে মানিকগঞ্জে। মধাবদীর পাইলট শুরু হয় ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে। মাত্র এগারোজন স্বাস্থ্যসেবিকা এবং দুজন তদারক কর্মী নিয়ে প্রথম প্রশিক্ষণ শুরু হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন নীল ব্লুমেনথেল এবং আব্দুস সালাম। দেখা গেল যে, স্বাস্থ্যসেবিকারা বেশ সহজেই গ্রামের লোকদের চোখ পরীক্ষা করছে এবং সঠিক চশমা দিচ্ছে। প্রথম পাইলট মাধবদীতে করার একটা উদ্দেশ্য ছিল। এ অঞ্চলটি তাঁত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে ঘরে ঘরে রয়েছে শত শত তাঁতকর্মী। আমাদের ধারণা ছিল যে, এদের মধ্যে অনেক তাঁতকর্মীর হয়তো চশমার প্রয়োজন হবে। প্রশিক্ষণের স্বল্প দিনের মধ্যেই ১শ চশমার সবগুলোই বিক্রি হয়ে যায়। আমাদের ধারণা সঠিক ছিল বলে প্রতীয়মান হলো।

এই প্রকল্পের অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটি ছিল চশমার যোগান দেওয়া। তখন সব রিডিং গ্লাসই চীন থেকে আসত, বাংলাদেশে এটি উৎপাদিত হতো না। পাইলটের জন্য সালাম পুরাতন ঢাকার বাংলাবাজার থেকে বিভিন্ন পাওয়ারের ১শ চশমা কিনে আনল। প্রতিটির দাম পড়েছিল ৬০ টাকা, যা সেবিকারা ১শ টাকায় বিক্রি করেছিল। ব্র্যাকের সেবিকারা নিয়মিত কোনো বেতন পায় না। তাই এই বিক্রি থেকে বাড়তি টাকার কিছু অংশ সেবিকাদের দেওয়া হয় প্রণোদনা বা ইনসেনটিভ হিসেবে। এই পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে আরও কিছু বিষয় পরীক্ষা করা হয়। রিডিং গ্লাসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং সেবিকাদের নতুন দক্ষতা (চোখের পরীক্ষা) প্রচারকল্পে একটি পোস্টার বা প্রচারপত্র তৈরি করা হয়। এগারোজন সেবিকার সকলের বাড়িতে একটি সাইনবোর্ডও শোভা পায়, যাতে লেখা ছিল, এখানে চোখ পরীক্ষা করে চশমা দেওয়া হয়। পাইলট প্রকল্পের সাফল্যে আমরা সবাই উৎফুল্ল এবং দারুণভাবে উৎসাহিত বোধ করি।

আমরা ভাবলাম আরেকটি পাইলটের কথা। ঠিক হলো মানিকগঞ্জে এটা চালিত হবে। মধাবদীর অনুরূপ সাফল্য পেলাম সেখানে। এখন আর কে আটকায়? পেছনে ফিরে তাকানোর সময় নেই। পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার জন্য সকলে মিলে লেগে গেলাম। অভিক্ষেপণ বা প্রজেকশন তৈরিতে নীল ব্লুমেনথাল আমাদেরকে সহায়তা করলেন। ঠিক হলো চীন থেকে ৬ হাজার চশমা নিয়ে আসা হবে। স্কজো ফাউন্ডেশনের সহায়তায় আমরা সেটা অর্ডার করলাম এবং একইসঙ্গে বাংলাদেশে সে পণ্য প্রবেশের আমদানীপত্র সংগ্রহ করা হলো। দেখলাম চশমা আমদানীতে অনেক ঝামেলা রয়েছে এবং এটার জন্য বড় অঙ্কের আমদানী শুল্ক দিতে হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত-এর কল্যাণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে আবেদনপত্র জমা দিয়ে চশমা আমদানীর শুল্ক ছাড় পেয়েছিলাম। তবে সেটি ছিল মাত্র ১ বছরের জন্য। বর্তমানে মিরপুরে একটি চশমা তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছে, যার ফলে বিদেশের ওপর নির্ভরতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

২০০৬ সালের ডিসেম্বরে মাসে সালাম ব্র্যাক আফ্রিকায় বদলী হলে এই কার্যক্রমের হাল ধরেন তপন বোস এবং প্রয়াত শাহ আলম সর্দার। নেতৃত্বে থাকেন ফারুক আহমেদ এবং জালালউদ্দীন আহমেদ। বর্তমানে মোরশেদা চৌধুরী ও আরিফুল আলম-এর নেতৃত্বে এই প্রকল্প এগিয়ে যাচ্ছে। ব্র্যাকের একটি বিশেষত্ব হলো তার কর্মসূচির ব্যাপ্তি বা 'স্কেল'। ব্র্যাকের প্রায় সকল কার্যক্রমই ছিল বিশালাকায়। ব্র্যাক বিশ্বাস করে, যেকোনো কার্যক্রম যদি কার্যকর হয় তবে তা যেন সকলের কাছে পৌঁছে। আজ তাই ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলা, গ্রামে-গঞ্জে প্রায় ১০ কোটি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছেছে। রিডিং গ্লাস প্রকল্প শুরুর সময় আমাদের মধ্যে সেই চিরায়ত আকাঙ্ক্ষাই কাজ করেছিল। এই স্কেল আর এর প্রতিটি পর্যায়েই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে, যা থেকে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল ব্র্যাককর্মীদের একনিষ্ঠতা আর উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে । মাঝে মাঝে এই কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে এই বলে যে, সেবিকারা এই কাজের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। স্বার্থান্বেষীদেও এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা স্থানীয় চোখের ডাক্তারদের (অপথালমোলজিস্ট) শরণাপন্ন হয়েছি। তারা সেবিকাদের প্রশিক্ষণ স্বচক্ষে অবলোকন করে এর পক্ষে সায় দিয়েছেন।

গত কয়েক বছরে রিডিং গ্লাস প্রকল্প দেশের ৬১টি জেলায় বিস্তৃতি লাভ করেছে, যার মাধ্যমে ২৫ হাজারেরও বেশি স্বাস্থ্যসেবিকা গ্রামাঞ্চলে চক্ষু পরীক্ষা এবং চশমা বিতরণ করে চলেছেন। চক্ষু পরীক্ষায় প্রেসবায়োপিয়া ধরা পড়লে চশমা দেওয়া হয়, কিন্তু অন্য সমস্যা হলে তাকে চোখের ডাক্তারের কাছে রেফার করা হয়। প্রায় ৮০ লক্ষ লোকের চক্ষু পরীক্ষান্তে এ পর্যন্ত প্রায় ১৬ লক্ষ জোড়া চশমা বিতরণ করা হয়েছে। ব্র্যাক টেকসই উন্নয়নে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী এবং একইসঙ্গে একটি স্বাবলম্বী ব্র্যাক আমাদের কাম্য। রিডিং গ্লাস প্রকল্প তাই বিদেশী অনুদানের ওপর আর ততটা নির্ভরশীল নয়। চশমার দাম দরিদ্র মানুষের নাগালের মধ্যে রেখেই প্রকল্পটি এগিয়ে চলেছে। এর

মাধ্যমে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যেমন উপকৃত হচ্ছে একইসঙ্গে সেবিকাদেরও একটি আয়ের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি একটি নিবিড় গবেষণা কাজের মাধ্যমে এই প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়। দেখা গেছে যে, চশমা ব্যবহারকারীদের আয় যারা চশমা ব্যবহার করছেন না তাদের আয়ের চাইতে শতকরা ২৩ ভাগ বেশি। চশমা ব্যবহারকারীদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ভাবতে ভালোই লাগে যে, গ্রামের একজন বয়স্ক মহিলা এখন স্বীয় ধর্মগ্রন্থ অনায়াসে পাঠ করতে পারছেন। এটা সম্ভব হয়েছে এই প্রকল্পের সহায়তায় রিডিং গ্লাস ব্যবহারের মাধ্যমে।

২০০৮ সালে স্কজো ফাউন্ডেশনের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম হয়েছে ‘ভিশন স্প্রিং’। সম্প্রতি বন্ধু জর্ডন কাসালো তার সংস্থার বোর্ড সদস্যদের নিয়ে বাংলাদেশ সফর করে গেলেন। সফরের শেষদিন অর্থাৎ ৪ঠা মার্চ ২০২০ তারিখ ছিল সমাপনী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে জানানো হয় যে, ‘ভিশন স্প্রিং’-এর সহায়তায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পে রিডিং গ্লাস প্রকল্প শুরু হয়েছে, যা শিল্পোদ্যোক্তারাই পরিচালনা করবেন। এর ফলে প্রতিবছর প্রায় ১ লাখ পোশাক শ্রমিক চক্ষু পরীক্ষার সুযোগ পাবেন। আর ব্র্যাকের স্বাস্থ্যসেবিকা চালিত প্রকল্প তো চলবেই, প্রতিবছর প্রায় ৮০ হাজার চক্ষু পরীক্ষা। আমরা আশা করতে পারি যে, অচিরেই প্রেসবায়োপিয়ার প্রকোপ থেকে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুক্তি পাবে।

সম্প্রতি ব্র্যাকের এই কার্যক্রম উগান্ডাতে সম্প্রসারিত হয়েছে। সেখানে দেড় হাজারেরও বেশি স্বাস্থ্যসেবিকা নিয়ে দেশব্যাপী চোখ পরীক্ষা এবং চশমা বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। বাংলাদেশের এই উদ্যোগটি এখন সুদূর আফ্রিকায় সমাদৃত হচ্ছে, যা সেই মহাদেশে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে। সমাপনী এই অনুষ্ঠানে জর্ডনের সঙ্গে আমি একটি স্মৃতি রোমন্থন সেশনে যোগ দিয়েছিলাম। আমরা সেখানে স্মরণ করছিলাম নিউইয়র্কে সিএফআর-এর সেই অনুষ্ঠান থেকে যাত্রা শুরু করে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৫ বছরের বৈচিত্রময় পথযাত্রার ইতিকথা। রিডিং গ্লাসকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর সাফল্যে ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিগহাম ইয়ং ইউনিভার্সিটি জর্ডন এবং আমাকে ‘ইনোভেটর অব দি ইয়ার’ পুরস্কারে ভূষিত করে। তখন সবেমাত্র ব্র্যাকে পাইলট প্রকল্পের প্রস্তুতি চলছে। পুরস্কারটি এসেছিল ঠিক ওই সময়ে। এ যেন আমাদেরকে এক ধরনের উৎসাহ প্রদানের উদ্যোগ। ২০০৯ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই বারাক ওবামাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ এটা ঘটেছিল এই ধারণা থেকে যে, এই দুর্লভ পুরস্কার লাভের মধ্য দিয়ে বিশ্ব শান্তি স্থাপনে তিনি আরও উৎসাহিত হবেন। জানিনা বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিশ্ব শান্তিতে কতটা অবদান রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু ব্র্যাক এবং ভিশন স্প্রিং ব্রিগহাম ইয়ং ইউনিভার্সিটিকে নিরাশ করেনি তা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। অনুষ্ঠানে জর্ডন কৌতুক ছলে বলেছিলেন যে, যেহেতু আমরা এই কবছরে দৃশ্যত অনেক অর্জন করেছি, সেই বিবেচনায় তাদের উচিত হবে আমাদেরকে আবারও পুরস্কৃত করা! তবে আজ মনে হয় যে, আমি তো বিপুলভাবে পুরস্কৃত হয়েছি। ব্র্যাকের এই প্রকল্প বাংলাদেশের কয়েক লাখ কর্মজীবী মানুষকে রক্ষা করেছে ক্ষয়িষ্ণু দৃষ্টিশক্তির গ্রাস থেকে। তাদের জীবন সংগ্রামে যুগিয়েছে নতুন আশার আলো। সেই পরিতৃপ্তিই তো আমার জন্য সর্বোচ্চ পুরষ্কার।

কৃতজ্ঞতা *: ফারুক আহমেদ, জালালউদ্দীন আহমেদ, ডা. আকরামুল ইসলাম, আব্দুস সালাম ও তপন বোস এবং আহমদ মাহমুদুর রাজা চৌধুরী।*